সন্তান লালন: পিতা-মাতার এক মহান দায়িত্ব

تربية الأطفال مسؤولية عظيمة على عاتق الآباء والأمهات

< بنغالي >

মুহাম্মাদ শামসুল হক সিদ্দিক

محمد شمس الحق صديق

সম্পাদক: ড. আবু বকর মুহাম্মাদ যাকারিয়া

مراجعة: د/ أبو بكر محمد زكريا

সন্তান লালন: মাতা-পিতার এক মহান দায়িত্ব

জীবনের শুরুতেই সন্তান যাদের হাতের স্পর্শ পায়, যাদেরকে সামনে দেখে, যাদের গন্ধ শুঁকে, তারা হলেন মাতা-পিতা। মাতা-পিতার হাত ধরেই সন্তান প্রবেশ করে কোলাহলময় পৃথিবীতে, গাত্রে লাগায় ইহজাগতিক আলো-বাতাস। মাতা-পিতার কাছ থেকেই শেখে প্রথম শব্দমালা। তাই মাতা-পিতার স্কন্ধেই অর্পিত সন্তানকে যথার্থরূপে মর্দে মুমিন তথা মানুষের মতো মানুষ হিসেবে গড়ে তোলার দায়িত্ব।

ইমাম গাযালি রহ. বলেছেন: সন্তান মাতা-পিতার কাছে আমানত। সন্তানের হৃদয় নকশা-ইমেজমুক্ত এক সরল-স্বচ্ছ মুক্তা, যা যেকোনো নকশা-ইমেজ ধারণ করতে প্রস্তুত। তাকে যে দিকেই হেলানো হবে সে সে দিকেই ঝুঁকে পড়বে। যা কিছু উত্তম ও ভালো তা যদি তাকে শেখানো হয়, তাকে যদি এগুলোর প্রতি অভ্যস্ত করে নেয়া হয় তবে সেভাবেই সে বড় হবে। ফলে তার মাতা-পিতা দুনিয়া ও আখেরাতে সৌভাগ্যবান হবে। তার উস্তাদ ও আদব-কায়দার শিক্ষকগণও তৃপ্তি অনুভব করবে। এর বিপরীতে তাকে যদি খারাপ বিষয়ে অভ্যস্ত করা হয়, জন্তু জানোয়ারের মতো তাকে লাগামহীন করে দেওয়া হয়, তাহলে সে ভাগ্যবিড়ম্বিত হবে, অতঃপর নিক্ষিপ্ত হবে ধ্বংসের গহ্বরে। আর এর দায়ভার বর্তাবে তাদের ঘারে যারা ছিল তার কর্ণধার, যাদের দায়িত্ব ছিল তাকে মানুষ হিসেবে গড়ে তোলার। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: প্রতিটি শিশু ফিতরতের ওপর জন্মগ্রহণ করে, আর তার মাতা-পিতা তাকে ইয়াহূদী, মাজুসী (অগ্নিপূজক) অথবা খ্রিষ্টান বানায়।[1]

সে হিসেবে সন্তান লালনে মাতা-পিতাকে হতে হবে যথেষ্ট সচেতন, ঐকান্তিক ও পরিশ্রমী। সন্তানের শারীরিক সুস্থতার প্রতি মাতা-পিতা নিঃসন্দেহে যথেষ্ট যত্নবান থাকেন। তবে এর পাশাপাশি, ধার্মিকতা, উন্নত চরিত্র, আল্লাহ-ভীরু হৃদয় ইত্যাদি পরিগঠনের ব্যাপারেও সন্তানের প্রতি যত্ন নিতে হয় সমধিক গুরুত্ব দিয়ে। কেননা সন্তান মাতা-পিতার কাছে গচ্ছিত এক আমানত। তাই সন্তানের শারীরিক পরিপুষ্টির পাশাপাশি হৃদয়ের পুষ্টি সরবরাহের প্রতি নজর না দিলে তা হবে আমানতের খিয়ানত ও সন্তানের প্রতি অন্যায়-অবিচার। সন্তানের হৃদয়কে পুষ্ট করার অর্থ ধর্মীয় ও মানবিক গুণাবলিতে ঋদ্ধ করে তোলা, আল্লাহর প্রতি গভীর বিশ্বাস, আখেরাতের প্রতি দৃঢ় ইমান ও ইসলামের অন্যান্য মৌলিক আকীদার প্রতি দৃঢ়চিত্ত করে বড় করা। এর অন্যথা হলে মাতা-পিতাকে আল্লাহর দরবারে জবাবদিহি করতে হবে নিশ্চিত রূপেই। হাদিসে পুরুষকে তার পরিবার পরিজনের দায়িত্বশীল, নারীকে তার স্বামীর বাড়িতে দায়িত্বশীল হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে এবং প্রত্যেককে যার যার দায়িত্বশীলতা সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হতে হবে বলে ঘোষণা এসেছে।

একটি বিশুদ্ধ বর্ণনা মতে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

«كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهله، ومسؤول عن رعيته ، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، والخادم راع في مال سيده، ومسؤول عن رعيته ، وكلكم راع ومسؤول عن رعيته».

[1] সহীহ বুখারী ও মুসলিম

“তোমাদের প্রত্যেকেই দায়িত্বশীল এবং তোমাদের প্রত্যেককেই তার দায়িত্বকর্ম সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হতে হবে। পুরুষ তার পরিবারে দায়িত্বশীল এবং সে তার দায়িত্বকর্ম সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে। নারী তার স্বামীর ঘরে দায়িত্বশীল এবং তাকে তার দায়িত্বকর্ম সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হতে হবে। সেবক তার মনিবের সম্পদে দায়িত্বশীল এবং তাকে তার দায়িত্বকর্ম সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হতে হবে। তোমাদের প্রত্যেকেই দায়িত্বশীল এবং তোমাদের প্রত্যেককেই তার দায়িত্বকর্ম সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হতে হবে”।[2]

সন্তান লালন একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব। এ দায়িত্ব অন্যের কাঁধে চাপিয়ে মাতা-পিতা তৃপ্তির নিঃশ্বাস ফেললে তা হবে দিবাস্বপ্ন দেখার মতো এক ঘটনা। যারা ভুক্তভোগী তারা বিষয়টি ভাল করেই বুঝেন। তবু বিষয়টি আরো পরিস্কার করার লক্ষ্যে একটি উদাহরণ দিচ্ছি:

জনৈক আমেরিকান নারী, তিনি তার নিজস্ব অভিজ্ঞতার আলোকে একটি গ্রন্থ রচনা করেছেন যার নাম ‘আপনার মত একজন স্মার্ট নারী বাড়িতে বসে কী করছে?’ উক্ত ভদ্র মহিলার বক্তব্যের সারসংক্ষেপ তার ভাষায় এই যে, আমার ঘরে থাকার ইচ্ছা কখনোই ছিল না, আমি রীতিমত এক কোম্পানির চাকুরে ছিলাম। ৩৩ বছর বয়সে আমার ঘরে একটি ছেলে সন্তান জন্ম নেয়। ওকে সামলাতে গিয়ে আমি চাকরি ছেড়ে দিতে বাধ্য হই। কিছুদিন যেতে না যেতেই আর্থিক অনটনের সম্মুখীন হয়ে দ্বিতীয়বার চাকরিতে ফিরে যাই। এ অবস্থায় বিকেল এবং সপ্তাহান্তের ছুটির দিনের সময়টুকু কেবল বাচ্চাকে দিতে সক্ষম হই। এ সামান্য সময়টুকু বাচ্চার জন্য কখনোই যথেষ্ট ছিল না। তাই একটা নার্সারি খুঁজে বের করে ওকে সেখানে রেখে আসি। নার্সারিটি অসম্পূর্ণ ভেবে একমাস পরেই বাচ্চাকে বাসায় নিয়ে আসি। দ্বিতীয়বারের মতো চাকরি ছেড়ে ঘরে বসে বাচ্চা সামলাতে আরম্ভ করি। দু’বছর সময় একটি উৎকৃষ্ট নার্সারির তালাশেই কেটে যায়; কিন্তু ততক্ষণে আমি দ্বিতীয় সন্তানের মা হয়ে বসি। আবারও একটা চাকরিতে ফিরে যাই। বাচ্চা দুটোকে একটা ঘরোয়া ধরনের নার্সারিতে রেখে অফিস করতে যাই। কিন্তু সেখানেও আমার কাঙ্খিত শিশুসেবা খোঁজে না পেয়ে হতাশ হই। পরিশেষে বাসায় বসে করার মতো একটি চাকরি খোঁজে নেই। আমি বাচ্চাদের নিয়ে যে তিক্ত অভিজ্ঞতার শিকার হই তা আমাকে একটি বিশেষ নৈতিক শিক্ষায় ঋদ্ধ করে। আর তা হল, আপনি যত আইন-ই প্রণয়ন করুন না কেন এবং যত পয়সাই খরচ করুন না কেন তা দিয়ে একজনের প্রতি অন্যজনের হৃদ্যতা-ভালোবাসা কখনোই সৃষ্টি করা যায় না।

আমি এমন এক ব্যক্তির তালাশে ছিলাম যিনি হবেন স্নেহী, প্রীতিপূর্ণ, দরদী, হৃদয়বিশিষ্ট, রসিক মেজাজের ও তৎপর। একজন সজীব হৃদয়বিশিষ্টি ব্যক্তি যিনি আমার বাচ্চাদের নৈতিকতাকে সুষমামণ্ডিত করবে। কৌতূহলোদ্রেককর পর্যটনে ওদেরকে নিয়ে বের হবে। ওদের প্রতিটি ছোট-ছোট প্রশ্নের উত্তর দেবে। ওদেরকে দুলিয়ে দুলিয়ে মিষ্টি ঘুম পাড়াবে। কিন্তু আস্তে আস্তে এবং বেদনাদায়কভাবে আমি এ তিক্ত সত্য পর্যন্ত পৌঁছেছি যে, আমি যার তালাশে মাসের পর মাস কাটিয়েছি সে তো আমি ভিন্ন অন্য কেউ নয়। এটাই হচ্ছে সে কাজ যা আমার মতো একজন স্মার্ট মেয়ে ঘরে বসে করছে।[3]

---

[2] সহীহ বুখারী ও মুসলিম

[3] রিডারস ডাইজেস্ট: অগাস্ট ১৯৮৮

এ ঘটনা থেকে স্পষ্ট বুঝা যাচ্ছে যে অন্য কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে যত টাকাই দেওয়া হোক না কেন সন্তানের প্রতি মাতা-পিতার যে মমত্ববোধ তা ক্রয় করা কখনো সম্ভব নয়। ফলে মাতৃপিতৃসুলভ মমত্ববোধ দিয়ে যথার্থরূপে সন্তানকে তালিম-তরবিয়তে ভূষিত করা, মানুষের মতো মানুষ করা কল্পনা বৈ অন্য কিছু হবে না।

বর্তমান যুগে অনেক মাতা-পিতাকে নিজের ছেলে-সন্তানের ব্যাপারে খুবই উদাসীন-বেপরোয়া হতে দেখা যায়। ফলে সন্তান যখন বখে যায়, ধর্মচ্যুত হয়ে অনাকাঙ্খিত জীবনযাপন শুরু করে, তখন হয়তো তাদের সম্বিত ফিরে আসে। আর সেসময় আক্ষেপ-অনুশোচনায়, মানসিক যাতনায় কালাতিপাত ছাড়া অন্য কোনো উপায় থাকে না। তখন হয়তো শুধরানোর সময় অবলীলায় পেরিয়ে যায়। অতীতের প্রতি হতাশার দৃষ্টিতে তাকিয়ে যন্ত্রণাবিদ্ধ হৃদয়ে দিবস-রজনী যাপন করতে বাধ্য হতে হয়। শুধু যে পৃথিবীর ক্ষণস্থায়ী জীবন আফসোস আক্ষেপে কাটাতে হয় তাই নয়, সময়ের কাজ সময়ে না করার কারণে, গচ্ছিত এক আমানতের খিয়ানত করার কারণে, একটি মানবাত্মাকে ধ্বংসের মুখে অবলীলায় ঠেলে দেওয়ার কারণে পরকালীন জীবনে মাতা-পিতাকে জবাদিহিতার সম্মুখীন হওয়া একটি দুর্পার ঘটনা।

বর্তমানে অবশ্য অনেক মাতা পিতা পড়ন্ত বিকেলে এসেও সম্বিত ফিরে পান না; কেননা তারা নিজেরাই অধার্মিকতাকে জীবনপথ হিসেবে বেছে নিয়েছেন। এরূপ ব্যক্তিদের নিজেদের পাপের বোঝা তো বহন করতেই হবে, সাথে সাথে তাদের কাছে গচ্ছিত আমানত, তাদেরই জীবনাচার, কৃতকর্মের কারণে ধ্বংস হয়েছে, পাপ ও অন্যায়ের পথ বেছে নিয়ে, আল্লাহ-বিমুখ হয়েছে, পরকাল বিমুখ হয়েছে। এ কারণে তাদেরকে অবশ্যই জিজ্ঞাসিত হতে হবে।

সে হিসেবে মাতা-পিতাকে তাদের কাছে গচ্ছিত আমানতের যথার্থ সম্মান করার স্বার্থে, নিজ সন্তানদের কাঙ্খিত মানবিক গুনাবলিতে ঋদ্ধ করে গড়ে তোলার স্বার্থে, নিজদেরকেও আল্লাহর আদেশ নিষেধের সীমানায় বেঁধে নিতে হবে, সন্তানদেরকেও আল্লাহর দেয়া মৌল প্রকৃতি (ফিতরত)-এর স্বচ্ছতা বজায় রেখে প্রকৃত অর্থে মর্দে মুমিন করে গড়ে তুলতে হবে।

সন্তানের দীন-ধর্ম, আদর্শ, মনোগঠন মাতাপিতার আদলে গড়ে উঠে। এ বিষয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্পষ্ট একটি হাদীস রয়েছে। আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

«ما من مولود يولد إلا يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء، هل تحسون فيها من جدعاء ؟ ثم يقول أبو هريرة : فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ، ذلك الدين القيم».

“সন্তান কেবল ফিতরত (ইসলাম)-এর উপর জন্ম লাভ করে, অতঃপর তার মাতা-পিতা তাকে ইয়াহূদী অথবা নাসারা অথবা অগ্নিপূজক বানায়, যেমনি পশু পূর্ণাঙ্গ-দেহী পশু জন্ম দেয়, যাতে কি কোনো নাক কর্তিত (খুঁতবিশিষ্ট) দেখতে পাও? এরপর আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু বলেন: আল্লাহর ফিতরত যার ওপর তিনি মানুষকে সৃষ্টি করেছেন”।[4]

[4] সহীহ বুখারী

সন্তান একটি পরিবারের গুরুত্বপূর্ণ অংশ। সন্তানকে কেন্দ্র করেই বরং যাপিত হয় অনেক পরিবারের দিবস রজনী, পরিবারের সকল দৌড়ঝাঁপের কেন্দ্রীয় টার্গেট থাকে সন্তানের নিরাপদ ভবিষ্যৎ নির্মাণ। আর যেহেতু সন্তানের ইহজাগতিক জীবনের স্বাচ্ছন্দের তুলনায় পরজাগতিক শাশ্বত জীবনের স্বাচ্ছন্দের গুরুত্ব অধিক; কেননা সে জীবনে জাহান্নামের প্রজ্বলিত আগুনে যাকে নিক্ষেপ করা হবে, তার দুঃখ-যন্ত্রণা, কষ্ট-যাতনার কোনো অন্ত থাকবে না। না পারবে কেউ তার ওপর আরোপিত আযাবকে সামান্যতম লাঘব করতে। তাই তো পরিবারের সদস্যদেরকে, যাদের মধ্যে স্নেহাস্পদ ছেলে সন্তানরা নিশ্চয় অন্যতম, পরকালের নারকীয় আযাব থেকে বাঁচানোর জন্য সকল প্রকার সতর্কতা অবলম্বন সর্বোচ্চ গুরুত্ব পাওয়া অত্যাবশ্যক। আল্লাহ বলেন:

﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ قُوٓاْ أَنفُسَكُمۡ وَأَهۡلِيكُمۡ نَارٗا وَقُودُهَا ٱلنَّاسُ وَٱلۡحِجَارَةُ﴾ [التحريم: ٦]

“হে মুমিনগণ, তোমরা নিজেদেরকে ও তোমাদের পরিবার-পরিজনকে আগুন হতে বাঁচাও, যার জ্বালানি হবে মানুষ ও পাথর।” [সূরা আত-তাহরীম, আয়াত: ৬]

আলী রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু “তোমরা নিজেদেরকে ও তোমাদের পরিবার-পরিজনকে আগুন হতে বাঁচাও”-এর ব্যাখ্যা করেছেন এ বলে যে, ‘তোমরা তোমাদের নিজেদেরকে ও তোমাদের পরিবারকে যা কিছু উত্তম তা শেখাও’।[5]

ইমাম ফখরুদ্দিন রাযী বলেছেন: “তোমরা নিজেদেরকে বাঁচাও”-এর অর্থ আল্লাহ যা নিষেধ করেছেন তা থেকে দূরে থেকে নিজেদেরকে বাঁচাও।[6]

ইমাম মুকাতিল উল্লিখিত আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেছেন: ‘মুসলিম ব্যক্তি নিজেকে ও তার পরিবারকে শিষ্টাচারে দীক্ষিত করে তুলবে, অতঃপর যা কিছু উত্তম তার নির্দেশ দেবে, ও যা কিছু অনুত্তম তা থেকে বারণ করবে।’

তাফসীরে কাশশাফে বলা হয়েছে: “তোমরা নিজেদেরকে বাঁচাও”-এর অর্থ গুনাহ বর্জন করে ও ইবাদত আনুগত্যের কাজগুলো করে তোমরা নিজেদেরকে বাঁচাও। আর পরিবারকে বাঁচানোর অর্থ: তাদের হিসেব নাও যে ব্যাপারে তুমি নিজের হিসেব নিয়ে থাক।’

সে হিসেবে সন্তানকে মানুষ করতে, সংশোধন করতে, সভ্য-ভদ্র করতে নিরচ্ছিন্নভাবে চেষ্টা করে যেতে হবে। কোনটা উত্তম, কোনটা অনুত্তম তা শেখাতে হবে। তাদের ভুলত্রুটি শুদ্ধ করার প্রচেষ্টায় যেন ছন্দপতন না ঘটে তার প্রতি অচ্ছেদ্য নজর রাখতে হবে। আর এটাই নবী-রাসূলগণের পদ্ধতি। নূহ আলাইহিস সালাম তার ছেলেকে ঈমানের দাওয়াত দিয়েছেন। ইবরাহীম আলাইহিস সালাম তার ছেলেদেরকে অদ্বিতীয় আল্লাহর ইবাদাত-আরাধনার উপদেশ করেছেন।

ইমাম নববী রহ. বুস্তানুল আরেফিন কিতাবে (দ্রঃ পৃষ্ঠা ৪৫) ইমাম শাফে‘ঈ রহ. থেকে বর্ণনা করে বলেন, তিনি ফুযাইলের উদ্ধৃতি দিয়ে উল্লেখ করেন যে, নবী দাউদ আলাইহিস সালাম একদা আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করে বললেন, ‘হে আল্লাহ! আপনি আমার জন্য যেমন ছিলেন, তেমনি আমার ছেলের ক্ষেত্রেও হবেন।

(জবাবে) আল্লাহ তা‘আলা অহী পাঠিয়ে বললেন: হে দাউদ! তুমি তোমার ছেলেকে বলো, সে যেন আমার জন্য তোমার মতো হয়, তাহলে আমি তোমার প্রতি যেরূপ ছিলাম তার প্রতিও সেরূপ হব।

[5] হাকেম: ৪/৪৯৪

[6] আত তাফসিরুল কাবির: ৩০/৬৪

এ কারণেই ইমাম গাযালী রহ. তার (হে বৎস) গ্রন্থে বলেন: তরবিয়তের অর্থ অনেকটা কৃষকের মতো; যে তার ফসলের জমিন থেকে কাঁটা ও আগাছা উপড়ে ফেলে দূরে নিক্ষেপ করে। উদ্দেশ্য তার ফসলের চারাগুলো যাতে হৃষ্টপুষ্ট হয়ে সুন্দরভাবে বেড়ে উঠতে সক্ষম হয়।

মাতা-পিতার দায়িত্বের ব্যাপারে ইমাম ইবনুল কাইয়্যিম খুব উপকারী একটি মন্তব্য করেছেন, তিনি বলেন: কয়েকজন আহলে ইলম তথা জ্ঞানবান ব্যক্তি বলেছেন যে, বিচার দিবসে প্রথমে পিতাকে তার সন্তান সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে। আর এটা হবে সন্তানকে তার পিতা সম্পর্কে প্রশ্ন করার পূর্বেই। কারণ, পিতার যেমন সন্তানের ওপর অধিকার রয়েছে, তেমনি সন্তানেরও পিতার ওপর অধিকার রয়েছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

"আমি মানুষকে তার মাতা-পিতার প্রতি সুন্দরতম আচরণ (ইহসান) করার উপদেশ দিয়েছি।" [সূরা আল-'আনকাবুত, আয়াত: ১৯]

আল কুরআনে সন্তানকে মাতা-পিতার প্রতি দায়িত্বশীল হওয়ার ব্যাপারে উপদেশ, মাতা-পিতাকে সন্তানের প্রতি দায়িত্বশীল হওয়ার নির্দেশের পরে এসেছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَلَا تَقْتُلُوٓاْ أَوْلَٰدَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَٰقٍۖ نَّحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْۚ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْـًٔا كَبِيرًا ٣١﴾ [الاسراء: ٣١]

"তোমরা তোমাদের সন্তানকে দারিদ্র্যের ভয়ে হত্যা করো না, নিশ্চয় আমি তাদেরকে রিযিক দিই এবং তোমাদেরকেও। নিশ্চয় তাদেরকে হত্যা করা বড় অন্যায়।" [সূরা আল-ইসরা, আয়াত: ৩১]

ইমাম ইবনুল কাইয়্যেম আরো বলেন, যে ব্যক্তি তার সন্তানকে উপকারী ইলম শেখানোর ব্যাপারে উদাসীনতা দেখাল, তাকে সে এমনিতেই ছেড়ে দিল, তার প্রতি সে অবিচার করল। আর অধিকাংশ ছেলে-মেয়ের নষ্ট হওয়ার কারণ পিতার অবহেলা, উদাসীনতা, মাতা-পিতা কর্তৃক তাদেরকে দীনের আবশ্যক বিষয়সমূহ, সুন্নতকর্মসমূহ সম্পর্কে মূর্খ রাখা। আর এভাবেই তারা ছোট কালেই বাচ্ছাদেরকে হারিয়ে ফেলে, অতঃপর বড় হয়ে না পারে তারা নিজেদেরও কোনো উপকার করতে, আর না আসে মাতা-পিতার কোনো কল্যাণে।

বলা হয় যে, এক ব্যক্তি তার ছেলেকে মাতা-পিতার প্রতি অবিচার করায় অভিযোগ করে গালমন্দ করছিল। প্রত্যুত্তরে ছেলে বলল: আব্বাজান! আমি যখন ছোট ছিলাম আপনি আমার প্রতি অবিচার করেছেন। তাই বড় হয়ে আমিও আপনার প্রতি অবিচার করলাম। ছোটকালে আপনি আমাকে ধ্বংস করেছেন, আমিও আপনাকে বৃদ্ধ বয়সে ধ্বংস করলাম।

পরিশেষে স্মরণ করিয়ে দিতে চাই যে, যে ব্যক্তি তার সন্তানদেরকে ঈমানে-আমলে, আখলাকে-চরিত্রে বলীয়ান করে সঠিক অর্থে মানুষ করতে ব্যর্থ হলো সে তার জীবনের সব চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মিশনে ব্যর্থ হলো। তাই প্রতিটি মাতা-মাতারই উচিত তাদের জীবনের এ গুরুত্বপূর্ণ মিশনে মরিয়া হয়ে চেষ্টা করে যাওয়া। প্রয়োজনে অন্যসব ব্যস্ততা সংকুচিত করে সন্তান লালনে যথেষ্ট পরিমাণ সময় দেওয়া। আল্লাহ আমাদের সবাইকে তাওফীক দান করুন। আমীন।

IslamHouse.com